The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.103 - 126)
Published in June, 2025

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা

ড. মোঃ মোরশেদুল আলম *

প্রতিপাদ্যসার: মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় অধ্যায়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় অর্জন বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ও ধারাবাহিক সংগ্রামের ফসল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও গণহত্যা চালায়। এ বর্বরোচিত হামলাকে প্রতিহত করার জন্য দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলার পর অবশেষে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ৯০ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। মহান এ স্বাধীনতা সংগ্রামে বীর বাঙালিরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশের প্রত্যেকটি পাড়া-মহল্লায় দুর্গ গড়ে তুলে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের পরাজিত করে দেশের জন্য এনে দিয়েছিলেন লাল সবুজের পতাকা। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তঝরা যাতনা এবং লাঞ্ছনার যে ঘটনাবলি, তার তুলনামূল্য হিটলারের নাজি বাহিনীকেও ছাপিয়ে গেছে। জেনোসাইড বাস্তবায়নের একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণহত্যা বা মাসকিলিং চালানো হয়। তবে জেনোসাইডে গণহত্যার ঘটনাতো বটেই; আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নারীদের ধর্ষণ করা থেকে শুরু করে জোরপূর্বক উদ্বাস্তু করা, সম্পদ লুট করা, পরিচয় বহন করে এমন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও ধ্বংস করা হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা এসকল অপরাধের প্রতিটি ঘটিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসচর্চায় বাঙালির বীরত্বের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। ফলে গণহত্যা, নির্যাতন, গণকবর-বধ্যভূমির ওপর তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের দোসর তথা জামায়াতে ইসলামি, মুসলিম লীগ, রাজাকার, আল বদর ও আল শামসের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় যে গণহত্যা চালিয়েছিল; তার পরিকল্পনা, গণহত্যার কারণ, প্রস্তুতি, ধরন, বাস্তবায়ন ও ব্যাপকতা এবং নারী নির্যাতন ও হত্যার বাস্তব চিত্র বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। গণহত্যার জাতীয় স্বীকৃতির বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

ভূমিকা :

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে এদেশবাসীর আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক যে বিরুদ্ধতার সূত্রপাত হয়, তা ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের মাধ্যমে সে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সার্বিক বিরুদ্ধতার চূড়ান্ত ও পরিণত ফললাভ সম্পন্ন হয়। বাংলাদেশের এ বিজয় অর্জন বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন এবং ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত ব্যাপক, বিস্তৃত ও তাৎপর্যপূর্ণ। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালির অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য ঢাকা সেনানিবাসে তৈরি করা 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক নীল নকশা অনুযায়ী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও গণহত্যা চালায়। এ বর্বরোচিত হামলাকে প্রতিহত করার জন্য দলমত নির্বিশেষে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে পরিকল্পিতভাবে আক্রমণের মধ্য দিয়ে ২৫ মার্চ রাতে গণহারে হত্যাকাণ্ড শুরু করে। তাদের প্রত্যেকটি আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল পূর্বনির্ধারিত, সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট। পাকিস্তানি সৈন্যরা রাজনৈতিক ব্যক্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও শিক্ষক, ঢাকার বস্তিবাসী এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর নির্বিচারে আক্রমণ চালায়। একইসঙ্গে পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ চালায়– যেখানে তারা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। কয়েকটি পত্রিকা অফিসও তাদের আক্রমণের শিকার হয়। পরবর্তীসময়ে রমনা কালী মন্দির, শাঁখারিবাজার, জিঞ্জিরা প্রভৃতি স্থানেও গণহত্যা চালায়। এরপর দেশব্যাপী গণহত্যা শুরু করে। তাদের ধ্বংসযজ্ঞের মাত্রা ক্রমে বেড়েই চলে। সবচেয়ে বেশি আক্রমণের শিকার হয় গ্রামের সাধারণ মানুষ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা ব্যাপকতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার দিক দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংসতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোনো যুদ্ধে অল্প সময়ে এত বেশি নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ হয়নি। নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিচারে গণহত্যার পাশাপাশি নারী নির্যাতনও চালিয়েছিল পাকিস্তানি সৈন্যরা। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন মোকাবিলা করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, রবার্ট পেইন রচিত *ম্যাসাকার*, সিডনি শনবার্গ রচিত *ডেটলাইন বাংলাদেশ: নাইন্টিন সেভেন্টিওয়ান*, Robert Jackson-এর *South Asian Crisis India-Pakistan-Bangladesh,* Jahanara Imam-এর *Of Blood and Fire: The Untold Story of Bangladesh's War of Independence,* Khadim Hussain Raja-এর *A Stranger in My Own Country East Pakistan, 1969-1971,* Rao Farman Ali Khan-এর *How Pakistan got divided,* Siddiq Salik-এর *Witness to Surrender,* Brown Miller-এর *Against Our Will: Men, Women and Rape,* G.W. Choudhury-এর *The Last Days of United Pakistan,* Anthony Mascarenhas-এর *The Rape Of Bangladesh,* A. A. K. Niazi-এর *The Betrayal of East Pakistan,* JFR Jacob-এর *Surrender At Dacca Birth Of A Nation*, Mohammed Ayoob & K. Subrahamanyan-এর *Liberation War* প্রভৃতি গ্রন্থ, ইতিহাস বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ, গবেষণাধর্মী জার্নালে প্রকাশিত গণহত্যা বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, মুক্তিযুদ্ধকালীন ও পরবর্তীসময়ে প্রকাশিত পত্রিকার প্রতিবেদন থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বর্তমান গবেষণাপ্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে প্রধানত দুটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে: ক) ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং খ) বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি। প্রথমত ইতিহাস অনুসন্ধান এবং একটি তথ্যগত ভিত্তি নির্মাণে ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সংঘটিত গণহত্যাকে ন্যারেটিভ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিচার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত এ পদ্ধতিতে বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াজাত করে আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উভয় ধরনের উৎস থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

প্রবন্ধ রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হলেও বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে মানসম্মত গবেষণা খুব একটা পরিলক্ষিত হয় না। বর্তমান গবেষণাপ্রবন্ধ রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

১) পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন বিষয়ে ধারণা দেওয়া।
২) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যার পরিকল্পনা তুলে ধরা।
৩) গণহত্যার কারণ, প্রস্তুতি, ধরন ও ব্যাপকতা পর্যালোচনা করা।
৪) গণহত্যা বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করা।
৫) মুক্তিযুদ্ধকালীন নারী নির্যাতন ও হত্যার বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করা।
৬) গণহত্যার জাতীয় স্বীকৃতির বিষয়টি তুলে ধরা।
৭) গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরা।
৮) গণহত্যাবিষয়ক গবেষণায় দেশের তরুণ ও ভবিষ্যত প্রজন্মের গবেষকদের অনুপ্রাণিত করা।
৯) দেশের জনগণ বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতিগঠনে অবদান রাখা।

গণহত্যার সংজ্ঞা ও আন্তর্জাতিক আইনঃ

গণহত্যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Genocide'. 'Genocide' শব্দটি গ্রিক 'genos' এবং ল্যাটিন 'cida' বা 'cide' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। গণহত্যা হচ্ছে জাতিগত, বর্ণগত, ধর্মীয় বা নৃতত্ত্বীয় গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচিত মানুষজনকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস করার ইচ্ছাকৃত কার্য। ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত ৯৬ (১) নং প্রস্তাবে বলা হয়, 'Genocide is a crime under international law which the civilized world condemns (Evans 197).' ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত রেজ্যুলেশনে ২৬০ (৩) এর অধীনে গণহত্যা বলতে বুঝানো হয়েছে এমন কর্মকাণ্ড যার মাধ্যমে একটি জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় বা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে (হাসান ১৪৯)। Genocide means racial killing, massacre, wholesale slaughter, mass slaughter, wholesale killing, indiscriminate killing, mass destruction, mass murder, bloodletting, ethnic cleansing etc. The term "genocide" did not exist prior to 1944. It is a very specific term, referring to violent crimes committed against a group with the intent to destroy the existence of the group. Human rights, as laid out in the US Bill of rights or the 1948 United Nations Declaration of Human Rights, concern the rights of individuals. In 1944, a Polish-Jewish lawyer named Raphael Lemkin (1900-1959) sought to describe Nazi policies of systematic murder, including the destruction of European Jews. He formed the word genocide by combining *geno-*, from the Greek word for race or tribe, with *–cide*, from the Latin word for killing. In proposing this new word, Lemkin had in mind "a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves." Genocide is a term used to describe violence against members of a national, ethnic, racial or religious group with the intent to destroy the entire group. ১৯৪৯ সালের 'Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide'-এর ২নং ধারায় নিম্নোক্ত আচরণ বা কার্যকে গণহত্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এগুলো হলো: ১) কোনো গোষ্ঠীর সদস্যকে হত্যা করা, ২) কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের সাংঘাতিক দৈহিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন করা, ৩) কোনো গোষ্ঠীর দৈহিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্টের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের উপর পরিকল্পিত জীবনধারা চাপিয়ে দেওয়া, ৪) কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে মানব জন্ম রোধের জন্য কোনো ব্যবস্থা প্রয়োগ করা এবং ৫) কোনো গোষ্ঠীর শিশুকে জোরপূর্বক অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর করা (মামুন ৬৮-৬৯)। এই চুক্তির ৪নং ধারায় বলা হয়: গণহত্যা, গণহত্যার

জন্য ষড়যন্ত্র, গণহত্যার পক্ষে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি, গণহত্যার প্রচেষ্টা এবং গণহত্যার সহযোগিতা প্রভৃতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। According to Encyclopedia Britannica, 'Genocide, the deliberate and systematic destruction of a group of people because of their ethnicity, nationality, religion or race.'

২০১৫ সাল থেকে জাতিসংঘের আয়োজনে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে ৯ ডিসেম্বর 'জেনোসাইড প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। 'Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide' অনুযায়ী 'জেনোসাইড' একটি আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়। জেনোসাইড প্রতিরোধ করা এবং জেনোসাইডের শাস্তি নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়। জেনোসাইডে মূল অপরাধ হচ্ছে জনগোষ্ঠীর পরিচয় নির্মূল করে দেওয়ার অভিপ্রায়। জেনোসাইড বাস্তবায়নের একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গণহত্যা বা মাসকিলিং চালানো হয়। তবে জেনোসাইডে গণহত্যার ঘটনাতো বটেই; আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নারীদের ধর্ষণ করা থেকে শুরু করে জোরপূর্বক উদ্বাস্তু করা, সম্পদ লুট করা, পরিচয় বহন করে এমন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও ধ্বংস করা হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা এসকল অপরাধের প্রতিটি ঘটিয়েছে। এসব অপরাধ ঘটানোর পেছনে তাদের অভিপ্রায়ও সুস্পষ্ট। দীর্ঘ স্বাধিকার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে যে নিজস্ব জাতিগত পরিচয় গড়ে উঠেছিল; পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য তা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর তাই সেই পরিচয় ধ্বংস করার জন্যই পাকিস্তানি রাষ্ট্রশক্তি এসব বহুমুখী নৃশংসতা ঘটিয়েছিল। জাতিসংঘ কনভেনশন অনুযায়ী, ১৯৭১ সালের নৃশংসতা একটি পূর্ণাঙ্গ জেনোসাইড। আর গণহত্যা হচ্ছে সেই জেনোসাইডে ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই সবদিক বিবেচনা করে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু হওয়া পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যা ও নৃশংসতাকে গণহত্যা তো বটেই; জেনোসাইডও বলা যায়।

গণহত্যার পরিকল্পনা:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে নৌকা প্রতীক নিয়ে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে গোপনে বাঙালি হত্যার নীল নকশা তৈরি করা হয়। ৭ মার্চ রেসকোর্সের জনসমুদ্র থেকে বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ঐতিহাসিক এ ভাষণে বাঙালি জাতিকে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।...রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ (রহমান ৭০২)।' বঙ্গবন্ধু সেদিন ১৮ মিনিটের ভাষণে পূর্ব বাংলার মানুষের ২৩ বছরের শোষণ-বঞ্চনার আর আত্মত্যাগের ইতিহাস তুলে ধরেন। পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন (রহিম ১৪৭)। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে কোনো ইতিবাচক ফলাফল না পেয়ে সবাইকে সর্বাত্মক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। সে রাতেই ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিকামী বাঙালি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে (Jackson 33)। জাহানারা ইমাম এ প্রসঙ্গে বলেন,

> After the remarkable success of the Resistance day on 23rd March, there was a shadow of gloom. Only disturbing news came from everywhere. The meetings between Yahya, Mujib and Bhutto failed to find a solution. Sheikh Mujib carried on his meetings with the President and after the meetings continued to repeat to the journalists that the talks were progressing. At the same time he asked the people to carry on with their struggle. He called upon to build fortresses in every house. For the last few days there have been rumours afloat that thousands of Pakistani troops were landing at Dhaka airport in plain cloths (Imam 36).

বাঙালিদের প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টির আগেই পাকিস্তান বাহিনী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পৌঁছার লক্ষ্যে অভিযান এগিয়ে নিয়ে ২৫ মার্চ রাত ১১ টা ৩০ মিনিটে শুরু করে। জেনারেল টিক্কা খান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। টিক্কা খান এ নির্দেশ পাওয়ার পর জিওসি মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাকে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য বলেন। মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি জিওসি-এর সদর দপ্তরে মিলিত হন। ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে একটি সামরিক অভিযানের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> The new plan, prepared by Farman and myself, was named 'Searchlight'. There was no particular significance to its name. We were now ready with the plan and were waiting for orders to implement it. The problem was faced was how we were to convey it to the subordinate commanders without compromising security. There were various constraints. As there was not enough time and negotiations were barely dragging on, we had to get on with things quickly so that all the relevant elements were ready for action throughout the province (Raja 73).

১৭ মার্চ চীফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানের নির্দেশে জেনারেল রাজা পরদিন ঢাকা সেনানিবাসে জিওসি অফিসে অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন। রাও ফরমান আলি অফিস প্যাডের হালকা নীল কাগজে পেন্সিলে হস্তাক্ষরে রচনা করেন 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক পাঁচ পৃষ্ঠার বাঙালি নিধনযজ্ঞের নীল নকশা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৪-২৫ মার্চ জেনারেল হামিদ, জেনারেল এ.ও মিঠঠা, কর্নেল সাদউল্লাহ হেলিকপ্টারে করে বিভিন্ন সেনানিবাসে প্রস্তুতি পরিদর্শন করেন। জেনারেল টিক্কা খান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান কিছুটা পরিবর্তন করে ২০ মার্চ এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৩ মার্চ তা অনুমোদন করেন। মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ২৪ মার্চ চট্টগ্রামে আসেন। সেনানিবাসের সিও ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সাথে করে তিনি ঢাকায় নিয়ে যান এবং অপারেশন সার্চলাইটের কপি চট্টগ্রামে রেখে যান (আনিসুজ্জামান ৩২)। সিদ্ধান্ত হয়, ২৫ মার্চ রাত ১টায় অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় অভিযানে ঢাকায় নেতৃত্ব দেবেন জেনারেল রাও ফরমান আলী। দেশের অন্যান্য অঞ্চলে নেতৃত্ব দেবেন খাদিম হোসেন রাজা। লে. জেনারেল টিক্কা খান ৩১ ফিল্ড কমান্ডে উপস্থিত থেকে অপারেশনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবেন। অভিযান সফল করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দুজন ঘনিষ্ঠ অফিসার মেজর জেনারেল জানজুয়া ও মেজর জেনারেল এ.ও মিঠঠাকে ঢাকায় আনা হয়। এ প্রসঙ্গে রাও ফরমান আলী খান বলেন,

> Knowing our reservation about military action two generals Iftikhar Janjua and Mitha were flown to Dacca to take over from us if we wavered or showed any weakness. Major General Mitha was later made Deputy to General Tikka as the high command had more confidence in him. Also present in Dacca at that time were Maj Gen Omar and Maj Gen Khuda Dad. They were all full of fire, ridiculing me and Khadim for soft attitude towards Awami League. We told them that we were not afraid of our lives, what we were worried about was Pakistan (Khan 83).

১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ দুপুরে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জেনারেল টিক্কা খানের (পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক, যিনি বেলুচিস্তান প্রদেশে কসাই নামে পরিচিত) বাসায় যান এবং জরুরি অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দেন। ইয়াহিয়ার নির্দেশ অনুসারে ২৪ মার্চ সিনিয়র সামরিক অফিসারদের বিভিন্ন সেনানিবাসে পাঠানো হয় কমান্ডারদের হাতে আদেশ পৌঁছে দেয়ার জন্য। এভাবেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকা অবস্থানকালেই বাঙালিদের ন্যায্য আন্দোলনকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন এবং ২৫ মার্চ অতি গোপনে করাচি যাওয়ার প্রাক্কালে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব বাংলায় গণহত্যা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় ও চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান করেন (ইসলাম ১৪২)। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার 'অপারেশন সার্চলাইট' বিষয়ে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা ছিল মূলত একটি সামরিক ব্যবস্থা (দারা ৯-২৪)। ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর সামরিক অভিযানের সূত্রপাত ঘটানো এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়াই ছিল এর মূল লক্ষ্য (ভূঁইয়া ১২)। অপারেশন সার্চলাইটের কৌশল ছিল ধুরন্ধর পদ্ধতি, আচমকা আক্রমণ, চূড়ান্ত শঠতা, ত্বরিত সাফল্য এবং অত্যধিক সন্ত্রাস। একই সঙ্গে সমগ্র দেশে অভিযান এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম দখলের বিশেষ উদ্যোগ। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার, সশস্ত্র বাঙালিদের নিরস্ত্র ও নিহত করা, ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা, বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ, সেনাবাহিনী-পুলিশ-ইপিআর-আনসার বাহিনীর বাঙালি অংশ, বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়, নারীসমাজ, ছিন্নমূল কর্মী ও সমর্থক শ্রমিক গোষ্ঠীকে সন্ত্রাস দিয়ে অবদমন করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য (মুহিত ১৯৯-২০০)। এ পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে দুইটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এগুলো হলো:

১। আওয়ামী লীগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বিদ্রোহ হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং সামরিক আইনকে প্রতিরোধ করার বিষয়ে দলটির অবস্থানকে বৈরী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
২। সেনাবাহিনীর (পূর্ব পাকিস্তান) মধ্যে আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল সদস্য থাকায় অপারেশন শুরু করতে হবে চাতুর্য, আচমকা এবং দ্রুতগতিতে।

অপারেশন সার্চলাইটের আওতায় গৃহীত পরিকল্পনাগুলো হলো:
১) একযোগে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশন শুরু হবে।
২) সর্বাধিক সংখ্যক রাজনীতিক ও ছাত্রনেতা, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার চরমপন্থীদের গ্রেফতার করতে হবে।
৩) ঢাকার অপারেশনকে শতকরা ১০০ ভাগ সফল করতে হবে। এ জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে হবে।
৪) সেনানিবাসের নিরাপত্তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।
৫) যাবতীয় অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যম বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, রেডিও, টিভি, টেলিপ্রিন্টার সার্ভিস, বৈদেশিক কনস্যুলেটসমূহের ট্রান্সমিটার বন্ধ করে দিতে হবে।
৬) ইপিআর সৈনিকদের নিরস্ত্র করে তদস্থলে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈনিকদের অস্ত্রাগার পাহারায় নিয়োগ করতে হবে এবং তাদের হাতে অস্ত্রাগারের কর্তৃত্ব দিতে হবে।

৭) প্রথম পর্যায়ে এ অপারেশনের এলাকা হিসেবে ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর, সৈয়দপুর ও সিলেটকে চিহ্নিত করা হবে। চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, রংপুর ও কুমিল্লায় প্রয়োজনে বিমানযোগে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

গণহত্যার প্রস্তুতি:

পাকিস্তানি গণহত্যার দুটি দিক ছিল। একটি হচ্ছে হিন্দু সম্প্রদায়কে তারা দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, হত্যা ও বিতাড়ন দুই প্রক্রিয়াই গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, তাদের বর্ণবোধ ছিল প্রগাঢ় এবং 'অবনমিত বা নিম্নজাতের' বাঙালিদের তৃণসম করার আকাঙ্ক্ষা তাদের ছিল খুবই প্রবল। এত অল্প সময়ে এত বড় হত্যাকাণ্ড সাধন করা সম্ভব হয় তিনটি কারণে, যথা ঘনবসতির দেশে হাজার হাজার হত্যা ছিল সহজ। নিরস্ত্র ও নির্বিরোধী বাঙালি সহজেই হত্যার শিকার হয়। তেজী ও উদ্দীপ্ত মুক্তিকামী বাঙালি পাকিস্তানিদের আক্রমণে নিজেদের জীবনের থোড়াই তোয়াক্কা করে (মুহিত ২১৬)। *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকা ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ মন্তব্য করেছিল, 'এই গৃহযুদ্ধ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও গেরিলা যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করলে বিপদজনক আন্তর্জাতিক পরিণতির সৃষ্টি করবে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্বের রাষ্ট্রবর্গের উচিত তাঁরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আহ্বান জানাবেন যেন মানবতা ও শুভ বুদ্ধির ভিত্তিতে তিনি রক্তপাত বন্ধ করেন এবং জনগণের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন (হোসেন ৪৫)।' গণহত্যা শুরুর প্রাক্কালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান করাচির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। আর পাকিস্তান পিপলস পার্টির সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল থেকে অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। ২৬ মার্চ ঢাকা ত্যাগের পূর্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্তব্য করেন, আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ যে পাকিস্তানকে রক্ষা করা গেছে। ইয়াহিয়া খানসহ সামরিক কর্মকর্তাদের সকলে অভিযানের প্রশংসা করেছিলেন। এমনকি ৫ আগস্ট পাকিস্তান সরকার যে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশ করে, তাতে ২৫ মার্চ সামরিক অভিযানকে অত্যাবশ্যকীয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় (শরীফ ২৪)।

ঢাকা শহরে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে প্রাধান্য দিয়ে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো হলো:

১) পিলখানায় অবিস্থত বালুচ রেজিমেন্ট বিদ্রোহী ৫ হাজার বাঙালি ইপিআর সেনাকে নিরস্ত্র করবে এবং তাদের বেতার কেন্দ্র দখল করবে।

২) আওয়ামী লীগের মুখ্য সশস্ত্র শক্তির উৎস রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ৩২নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট এক হাজার বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করবে।

৩) ১৮নং পাঞ্জাব রেজিমেন্ট শহরের হিন্দু অধ্যুষিত নবাবপুর ও পুরনো ঢাকা এলাকায় আক্রমণ চালাবে।

৪) ২২নং বালুচ, ১৮ ও ৩২নং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের বাছাই করা একদল সৈন্য আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী শক্তিকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (জহুরুল হক), জগন্নাথ হল ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিয়াকত হল আক্রমণ করবে।

৫) বিশেষ সার্ভিস গ্রুপের এক প্লাটুন কমান্ডো সৈন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি আক্রমণ ও তাঁকে গ্রেফতার করবে।

৬) ফিল্ড রেজিমেন্ট দ্বিতীয় রাজধানী ও সংশ্লিষ্ট বসতি (মোহাম্মদপুর-মিরপুর) নিয়ন্ত্রণ রাখবে।

৭) শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশে এম ২৪ ট্যাংকের একটি ছোট্ট স্কোয়াড্রন আগেই রাস্তায় নামবে এবং প্রয়োজনে গোলাবর্ষণ করবে (Salik 72-73)।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের পূর্বে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ঘোষণাটি ছিল,

> This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh whereever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved (Batabyal 17).

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এককালীন মন্ত্রী ও পাকিস্তানপন্থী লেখক G. W. Choudhury বলেন,

> It is most tragic that Pakistani Army instead of penalizing the person who eliminated all chances of settlement plunged into ruthless and unprecedented atrocities on unarmed Bengali population- a vile campaign in which thousand of innocent women, old people, sick people and children were brutally murdered, millions fled their homes to take their shelter in India (Choudhury 136).

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পূর্ববাংলার আপামর জনসাধারণ সর্বশক্তি দিয়ে পাকিস্তানি হায়েনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলে।

গণহত্যার ধরন:

গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট এবং গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গণহত্যা কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত ৭৪টি গণহত্যা নির্ঘণ্টকে উৎস হিসেবে ধরে গণহত্যার ধরন সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো:

গণহত্যার ধরন (শরীফ ৬৩)

ধরন		সংখ্যা
শরণার্থীদের গণহত্যা		০৬
প্রতারণার মাধ্যমে গণহত্যা		০৩
আশ্রিতদের হত্যা		০২
মুক্তিযোদ্ধা বা সংগঠকদের খোঁজ করতে গিয়ে হত্যা		১২
নিয়মিত গণহত্যা		১১
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা প্রতিশোধমূলক হত্যা		২০
সাম্প্রদায়িক গণহত্যা		১৪
অন্যান্য গণহত্যা		০৬
মোট	=	৭৪টি

এগুলো ছাড়াও মুক্তযুদ্ধকালীন অনেক ধরনের গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো (শরীফ ৫৫-৬৮):

১) চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় কাঁথা দিয়ে মুড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে হত্যা।

২) নদী এলাকায় হত্যার পর পেট কেটে লাশ নদীতে ফেলে দিত।

৩) রংপুরের বালারখাইলে পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতনে আহতদের জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে হত্যা করত।

৪) নাটোর সদরের ছাতনীতে পাকিস্তানিরা ৭৮ জন নিরীহ মানুষকে এসিড দিয়ে ঝলসিয়ে হত্যা করেছিল।

৫) নীলফামারীর ডাকবাংলাতে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে পাট বেলিং প্রেসার যন্ত্র দিয়ে বন্দিদের ওপর অত্যাচার করা হতো।

৬) নীলফামারী কলেজের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের পেছনের গভীর কূপের মধ্যে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে হত্যা করেছিল।
৭) দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলার কাঁকড়া রেলব্রিজ গণহত্যায় শহিদদের পাকিস্তানি সৈন্যরা বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দিয়েছিল।
৮) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার দাউরা গ্রামে নিরীহ মানুষকে হত্যা করে তাদের লাশগুলোর ওপর খড়ের গাদা ছড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।
৯) পাকিস্তানি বাহিনী কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার লালমাই পাহাড়ে বিমানের মাধ্যমে গোলাবর্ষণের মাধ্যমে গণহত্যা চালায়। কুমিল্লার লাকসামেও এমন আক্রমণ চালায়। চট্টগ্রাম শহরের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ও এর আশেপাশের এলাকায় বোমাবর্ষণ করে।
১০) দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার গণহত্যায় টেনা গ্রামের আজিজুর রহমানকে ধরে নিয়ে গিয়ে কাঁসার থালা আগুনে গরম করে বুক ও পিঠে ছ্যাঁকা দিয়ে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে।
১১) বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার ডাকবাংলো বধ্যভূমিতে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে জবাই করে হত্যা করে।
১২) মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার বাউশি ক্যাম্পে ভবেরচরের ইদ্রিস আলীর শরীর থেকে সিরিঞ্জ দিয়ে প্রচুর রক্ত বের করে নেওয়ায় রক্ত শূন্যতায় মারা যান।
১৩) দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার গণহত্যায় কংশরা গ্রাম থেকে ধরে আনা আব্দুস সাত্তারকে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রেখে গরম পানি ও গরম ভাতের মাড় ফেলে হত্যা করেছে।
১৪) ইলেকট্রিক শক দিয়ে হত্যা।
১৫) জিপের পেছনে বেঁধে সারা শহর ঘুরিয়ে হত্যা করা হতো।

গণহত্যা বাস্তবায়ন:

১১ টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তানি সৈন্যরা সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে এসে ফার্মগেটে মিছিলরত বাঙালিদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে অপারেশন সার্চলাইটের সূচনা ঘটায় (Mohan 14)। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালির অস্তিত্বকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে মুছে ফেলার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মার্চ 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক নীল নকশা অনুযায়ী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও গণহত্যা চালায় (পেইন ১১)। একই সাথে বাঙালি ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে প্রতিরোধ আসতে পারে ভেবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদেরকে নির্মূল করার জন্য আক্রমণ চালায় (পারভিন ৭৩)। সেনানিবাস, সীমান্ত ফাঁড়ি ও পুলিশ লাইনগুলোতে পাকিস্তানি বাহিনী সরাসরি হামলা চালিয়ে অস্ত্রাগারগুলো দখল করে নেয় (Sumit 73)। মেজর জেনারেল কে. এম. শফিউল্লাহ ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলেন, '২৫ মার্চ রাতে ঢাকা নগরীর উপরে মৃত্যুঘণ্টা বেজে ওঠে। বন্দুক, কামান এবং ট্যাংকের বিশ্রী শব্দ ঘুমন্ত নগরীর নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে এবং সহসা জেগে ওঠা নগরবাসী নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় (শফিউল্লাহ ৪৬)।' মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর সংঘটিত হত্যাযজ্ঞে শুধু অগণিত নারী-পুরুষই প্রাণ হারায়নি; এতে বাংলার সাধারণ জনগণের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতিও হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রত্যক্ষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আজও অজ্ঞাত (Miller 81)। Rounaq Jahan ২৫ মার্চের গণহত্যা প্রসঙ্গে বলেন,

> On March 25, 1971, when the Pakistani government initiated military action in Bangladesh, a number of sites and groups of people were selected as targets of attack. In Dhaka, for example, the university campus, the headquarters of the police and the Bengali paramilitia, slums and squatter settlements, and Hindu majority localities, all

> were selected as special targets. The Pakistani ruling elite believed that the leadership of the Bengali nationalist movement came from the intellectuals and students, that the Hindus and the urban lumpen proletariat were the main supporters, and that the Bengali police and army officials could be potential leaders in any armed struggle. In the first two days of army operations, hundreds of unarmed people were killed on the university campus, and in the slums and the old city were Hindus lived (Jahan 70-71).

পাকিস্তানি সৈনিকদের আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ভৌমিক ২৮)। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসস্থল, কলাভবন, শহিদ মিনার, রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, মধুর ক্যান্টিন, বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন অন্যান্য বাড়িঘর ও বসতি (চৌধুরী ১৯)। জগন্নাথ হলে ৩৬ জন ছাত্র, রোকেয়া হলের কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যসহ ৪৬ জনকে হত্যার পর গণকবরে সমাধিস্থ করা হয়। পরিসংখ্যান বিভাগের রীডার এ এন এম মুনিরুজ্জামান, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ড. অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য, ড. ফজলুর রহমানসহ ১১ জন শিক্ষক পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার শিকার হয় (সেলিম ৮২)। অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ ছিলেন ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও সহকারী আবাসিক শিক্ষক ড. অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য শহিদ হন। হলের বাইরে থাকলেও গণহত্যার পর গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মৃতদেহ জগন্নাথ হলের গণকবরে পাকিস্তানি বাহিনী অমার্জনীয় অবহেলায় সমাহিত করে। ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার কণ্ঠদেশে গুলি লাগে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মরদেহের শেষকৃত্য সম্পাদন সম্ভব হয়নি (চক্রবর্তী ১৭)। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সারি বেঁধে হত্যা করা হয়েছে ছাত্রদের, বাসায় গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে শিক্ষকদের, ছাত্রী হলে গিয়ে নারকীয় নির্যাতন করা হয়েছে মেয়েদের (কামাল ৪১)। এছাড়াও তারা আক্রমণ করে রাজনৈতিক ব্যক্তি, ঢাকার বস্তিবাসী এবং হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পিলখানা ও রাজারবাগ। তাছাড়া কয়েকটি পত্রিকা অফিসও আক্রমণের শিকার হয়। পরবর্তীসময়ে রমনা কালী মন্দির, শাঁখারি বাজার, তাঁতী বাজার, বাবু বাজার, নয়া বাজার, গোয়াল নগর, ইংলিশ রোড, জিঞ্জিরা প্রভৃতি স্থানে গণহত্যা চালায় (বিশ্বাস ৩১৬)। একই পরিকল্পনার আওতায় পুরনো ঢাকা, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দর, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানেও আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। ২৫ মার্চের রাতের অন্ধকারে শুধুমাত্র ঢাকায় সেদিন পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার নিরীহ মানুষকে অকাতরে জীবন দিতে হয়েছিল (কবির ১১-১২)। মুসলমান সম্প্রদায় ছাড়াও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবেই সারাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করেছে; তাদের বাড়িঘর, দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে ধ্বংস করেছে; টাকা-পয়সা, সোনার-গহনা, অস্থাবর সম্পত্তি লুট করেছে, যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। আবার কোথাও ধর্ষণের পর হত্যাও করেছে। কোনো কোনো অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণেও বাধ্য করেছে। কেবল হিন্দু সম্প্রদায় নয়–পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকেও হত্যা করেছে (বিশ্বাস ১৫)। অ্যান্থনি মাসকারেনহাস বলেন,

> There is no general knowledge of the unspeakable cruelties visited on thousands of defenceless men, women and children in the violent upsurge of the East Bengalies that followed the campaign of genocide launched by the Pakistani army on 25 March 1971. The horrifying acts-killings, rape and the mutilation of women and children-are understandably an embarrassment to the sensitive people of Bangla Desh now locked in the battle for their homeland. Nevertheless they constitute a fact of life which cannot be ignored (Mascarenhas 118).

১৯৭৭ সালে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় অবস্থানকারী পাকিস্তানি মেজর ২৫ মার্চ রাতে শুরু হওয়া অপারেশন সার্চলাইট-এর যে বিবরণ দিয়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

> অপারেশন সার্চলাইটে ঢাকার রাস্তায় ব্যবহারের জন্য রংপুরস্থ ২৯ ক্যাভালরির ৬টি ট্যাংক এবং তার ক্রু'দের আনা হয়। মার্শাল ল হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয় দ্বিতীয় ক্যাপিটালে (আগারগাঁও)। একটি গোপন সংকেতের মাধ্যমে ১৪ ডিভিশনের সদর দপ্তর থেকে 'গ্যারিসনগুলো'কে 'এইচ আওয়ার' বা আক্রমণের সময় সম্পর্কিত সংকেতটি পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রাথমিকভাবে রাত ১টাকে এই আঘাতের সময় নির্ধারণ করে কাগজে কলমে এইচ আওয়ারটি লেখা হয় ২৬-০১-০০। অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাত ১টায় অপারেশন সার্চলাইট নামক নারকীয় আঘাত শুরুর সময় বলে নির্ধারিত হয়। পরে ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০টায় এটি এগিয়ে আনা হয়। ৫৭ ব্রিগেডের ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে ঢাকা সেনানিবাসে রিজার্ভ হিসেবে মোতায়েন করা হয় এবং ঢাকা সেনানিবাসের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ৪৩ হালকা বিমানবিধ্বংসী রেজিমেন্টকে ঢাকা বিমানবন্দরে মোতায়েন করা হয়। ২২ বেলুচ রেজিমেন্টকে পূর্ব থেকেই পিলখানাস্থ ইপিআর সদর দপ্তরে মোতায়েন করা হয়েছিল। এই ব্যাটালিয়নকে পিলখানায় অবস্থানরত প্রায় ২৫০০ বাঙালি ইপিআর সৈন্যকে নিরস্ত্র করার আদেশ দেওয়া হয়। এদেরকে অয়্যারলেস এক্সচেঞ্জ দখল করার আদেশও দেওয়া হয়। ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করে প্রায় ১০০ বাঙালি পুলিশকে নিরস্ত্র করার আদেশ দেওয়া হয়। ১৮ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে পুরাতন ঢাকার নওয়াবপুর এলাকায় মোতায়েন করা হয় এবং শেরেবাংলা নগরে দ্বিতীয় রাজধানী এলাকায় ফিল্ড রেজিমেন্টকে পার্শ্ববর্তী মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকায় বসবাসরত বিহারীদের রক্ষা করার জন্য মোতায়েন করা হয়। এছাড়া ১৮ পাঞ্জাবের এক কোম্পানী, ২২ বেলুচের এক কোম্পানী ও ৩২ পাঞ্জাবের এক কোম্পানী সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা: বিশেষ করে ইকবাল হল ও জগন্নাথ হল আক্রমণ করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং এক কোম্পানী কমান্ডোকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে আটকের আদেশ দেওয়া হয়। এক স্কোয়াড্রন এম-২৪ ট্যাংক ২৬ মার্চ রাতে ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয় (হাসান ৬৩-৬৫)।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উপর আক্রমণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ও পুরনো ঢাকায় নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করার জন্য ৩২ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল তাজ মোহাম্মদ খানকে পাকিস্তানের সামরিক খেতাব 'সিতারা-ই-জুররত' উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়। ২৫ থেকে ২৮ মার্চ ঢাকা শহরে প্রথম ধাপের হামলা সম্পর্কে বলা হয়:

> ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে শুরু হওয়া অপারেশন সার্চলাইট এবং পরবর্তী নয় মাস যে গণহত্যা চালানো হয় পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা তার একটা অন্যতম লক্ষ্যে পরিণত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা পুরনো ঢাকার তাঁতীবাজার, শাঁখারীবাজার, নবাবপুর, ইংলিশ রোড, বাবুবাজার, নয়াবাজার, কোর্ট হাউজ পাড়া, গোয়ালনগর এলাকায় গণহত্যা চালায় ২৬ মার্চ বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত। ২৭ মার্চ দুপুরে তারা আক্রমণ করে নবাবপুর থেকে ইংলিশ রোডের মধ্যবর্তী এলাকা। রাস্তার দুদিকে তারা আগুন ধরিয়ে দেয় এবং পলায়নরত নারী-পুরুষ ও বৃদ্ধদের নির্বিচারে হত্যা করে। আগুন ছড়িয়ে যায় ইংলিশ রোড থেকে সুইপার কলোনী পর্যন্ত, সদরঘাট বাস স্টপেজের চারদিকে, কলেজিয়েট হাইস্কুল, জগন্নাথ কলেজ, সদরঘাট গির্জা, নবাবপুর রোডের সর্বত্র, ক্যাথলিক মিশনের বাইরে ও ভিতরে এবং আদালত প্রাঙ্গনে। গণহত্যার শিকার হওয়া মানুষের মৃতদেহগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে কয়েকদিন। পরে ঢাকা পৌরসভার সুইপারদের সহায়তায় ২৮ মার্চ থেকে ট্রাকে করে মৃতদেহগুলো স্বামীবাগ আউটকল, ধলপুর ময়লা ডিপো এবং ওয়ারী আউটকলে নেওয়া হয়। সেখানে পূর্ব থেকে করা বড় বড় গর্তে লাশগুলো ফেলে মাটি দেওয়া হয় (হাসান ৬৩-৬৫)।

মো. মজিবুর রহমান ১৯৭১ সালে পুলিশের স্পেশাল আর্মস ফোর্সের (এসএএফ) কনস্টেবল ছিলেন। তবে ডেপুটেশনে রাজারবাগ রিজার্ভ অফিসে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকার রাজারবাগসহ অন্যান্য এলাকায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় সে প্রসঙ্গে একটি নিবন্ধে লেখেন, '২৫ মার্চ রাত আনুমানিক ১০টার দিকে একটা বেবিট্যাক্সি করে কয়েকজন লোক রাজারবাগের ২ নম্বর গেটে আসে। তারা সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের বলে যায়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আজ আপনাদের ওপর হামলা করবে। আপনারা সজাগ হোন, সতর্ক হোন। এই সংবাদ রাজারবাগসহ আশেপাশের সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। রাজারবাগকে রক্ষা করার জন্য সাধারণ মানুষ মালিবাগ, মৌচাক, শান্তিনগর বিভিন্ন জায়গায় গাছ দিয়ে রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। এই ব্যারিকেড আর্মিদের জন্য কিছুই না। রাজারবাগ পুলিশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য প্রত্যেকেই যার যার মতো পোশাক পড়ে তড়িঘড়ি প্রস্তুতি নেয়। অস্ত্র নেওয়ার জন্য সবাই অস্ত্রাগারের দিকে যায়।...অস্ত্রাগার খুলে অস্ত্র নেই। পুলিশের হাতিয়ার তখন ছিলই থ্রি নট থ্রি আর মার্ক ফোর রাইফেল। দুই অস্ত্রের একই ফাংশন। একই গুলিতে চলে। এই রাইফেল নিয়ে যার যার মতো বিভিন্ন জায়গায় আমরা অবস্থান নিই। রাজারবাগে তখন চারতলা একটা বিল্ডিং ছিল। সেটাতে ছিল এসএএফ ব্যারাক।...রাত আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মালিবাগ, শান্তিনগরসহ তিন দিক থেকে আক্রমণ করে। চারদিক থেকে গুলি আর বিস্ফোরকের শব্দ। এমন সব শব্দ যেগুলো আগে কখনো শুনিনি। পরে শুনেছি, ট্যাংক, মর্টার, রকেট লাঞ্চার, হেভি মেশিনগান ছিল। তারা ফ্ল্যাশ লাইট মারছিল আর হামলা চালাচ্ছিল। তাদের আক্রমণটা ছিল অতর্কিত। আমাদের যে থ্রি নট থ্রি রাইফেল, এটা দিয়ে আমরা সবাই প্রতিহত করার চেষ্টা করি। কিন্তু তাদের এই ভারী অস্ত্রের মধ্যে আমাদের গুলি লাগানো ছিল খুবই কষ্টকর।...রাত আনুমানিক আড়াইটার সময় প্রথমে আরআরএফ ব্যারাকের পশ্চিম পাশে আগুন ধরে যায়। এর কিছুক্ষণ পর আগুন লাগে চারতলা ভবনেও (*প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০২১)।'

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ মার্চ লন্ডনের *The Daily Telegraph* পত্রিকার সংবাদদাতা সাইমন ড্রিং একটি নিবন্ধে ২৫ ও ২৬ মার্চ ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সামরিকজান্তা কর্তৃক সংঘটিত হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ প্রদান করেন। ঢাকায় অবস্থানকালীন তিনি দেখেছেন রাতের অন্ধকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা এম-২৪ ট্যাংক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস আক্রমণ করেছে। ঢাকাস্থ ব্রিটিশ লাইব্রেরীর ছাদ থেকে পাঞ্জাবি সৈন্যরা কামানের গোলা নিক্ষেপ করেছে। ইকবাল হল, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা ইপিআর ব্যারাক এবং এর আশেপাশের এলাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ঢাকার বাজার, মার্কেট, রাজপথ ও পুরনো ঢাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দুরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মূল শিকারে পরিণত হয়েছিল (সরকার ৩৭)। সাইমন ড্রিং এক সাক্ষাৎকারে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে তার একটি বর্ণনা দিয়েছিলেন,

> ২৫ মার্চের কয়েকদিন আগেই ঢাকার পরিস্থিতি কেমন থমথমে হয়ে ওঠে। আমার মনে হচ্ছিল পাকিস্তানিদের রাজনৈতিক সমাধানের কোনো ইচ্ছে নেই। কারণ একদিকে আলোচনা চলছিল, অন্যদিকে প্লেনে, জাহাজে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য-অস্ত্র আনা হচ্ছিল।...২৫ মার্চ রাত ১০টার দিকে আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে সৈন্যদের প্রথম দলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যায়। সৈন্যদের মধ্যে তিনটি গ্রুপ ছিল-আর্টিলারি, ইনফ্যান্ট্রি এবং আর্মার্ড। এর কিছু সময় পর থেকেই শুরু হলো গোলাগুলি। দেখলাম শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে আগুনের শিখা উপরে উঠছে। মানুষের আর্ত-চিৎকারের শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল (সরকার ৪৫৩)।

২৭ মার্চ সকালে ২ ঘণ্টার জন্য কারফিউ তুলে নেওয়া হলে সাইমন ড্রিং ও একজন ফরাসি ফটোগ্রাফার বিধ্বস্ত ঢাকার অবস্থা দেখতে বেরিয়ে পড়েন। পাকিস্তান সরকারের সৈন্যদের চালানো হতবাক করে দেওয়ার মতো এক ধ্বংসযজ্ঞ তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন। পুরো শহরকে যেন পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে (মামুন ২১৫)। তাঁরা দেখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল (বর্তমান সার্জেন্ট জহুরুল হক হল), রাজারবাগ পুলিশ লাইন এবং ধানমণ্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি। ইকবাল হলে চোখে পড়ে এক চরম ধ্বংসযজ্ঞ। সবকিছু পোড়া বিধ্বস্ত, ছাত্রদের লাশ যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যাওয়ার পথে অসংখ্য পথচারির সঙ্গে তাঁদের কথা হয়। করুণ এক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দেয় তারা। পাকিস্তানি মিলিটারিদের জিপ যেখান দিয়ে গিয়েছে, সেখানে সবকিছু মেশিনগানের গুলিতে শেষ করে দিয়েছে। সৈন্যরা যাকে সামনে পেয়েছে মেশিনগান থেকে ব্রাশ ফায়ার করেছে। ঘুমন্ত মানুষকে পর্যন্ত তারা গুলি করে মেরেছে। আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী বলেন,

> On the night between 25/26 March 1971, General Tikka struck. Peaceful night was turned into a time of wailing, crying, and burning. General Tikka let loose everything at his disposal as if raiding an enemy, not dealing with his on misguided and misled people. The military action was a display of stark cruelty, more merciless than the massacres at Bukhara and Baghdad by Changez Khan and Halaku Khan, or at Jallianwala Bagh by the British General Dyer (Niazi 45-46).

ইংরেজি দৈনিক *The People*- পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ২৫ মার্চ রাতে ‘অবরুদ্ধ বাংলাদেশ: কণ্ঠরুদ্ধ সংবাদপত্র’ শিরোনামে একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করার সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পত্রিকার অফিস আক্রমণ করে। বোমা আর গোলার আঘাতে অফিসটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং ছয় জন সাংবাদিক নিহত হন। পত্রিকাটি আওয়ামী লীগ সমর্থক ছিল বলে তা গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইয়াহিয়া খান নিজেই *The People* পত্রিকাকে জঘন্য বলেছেন। কারণ শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং পত্রিকাটি নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে ইয়াহিয়া খান মনে করতেন (মামুন ১০২)। ৩১ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক পূর্ববঙ্গে গণহত্যা বন্ধের দাবি জানান। ২ এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্ণি গণহত্যার নিন্দা করে ইয়াহিয়া খানের নিকট পত্র লেখেন (সাইয়িদ ৫৯)। এ প্রসঙ্গে জ্যাকব ফ্রেডরিক রালফ জ্যাকব লিখেছেন,

> The repercussions of the Pakistani crackdown, meanwhile, were being felt in India. As the actual situation came to be known, there was a public outcry and demands for immediate intervention. On 31 March the Indian Parliament passed a resolution calling on Pakistan to ‘transfer power to the legally elected representatives of the people of East Bengal’. The country was shocked at the scale of Pakistani atrocities because of which refugees were pouring into India. What began as a trickle in late March was to become a steady stream between April and June, and to continue until October (Jacob 35).

নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদদাতা সিডনি শনবার্গ ২৫ মার্চ রাতে ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বর্ণনা থেকেও ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বলেন,

> ৭৫ মিলিয়ন মানুষের পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য নিরস্ত্র সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী কামান ও ভারী মেশিনগান ব্যবহার করছে।...কোনো সতর্কীকরণ ছাড়াই বৃহস্পতিবার রাতে আক্রমণ শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা, সেনাবাহিনীতে রয়েছে যাদের সংখ্যাধিক্য, প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকার রাস্তায় নেমে আসে বিশ্ববিদ্যালয়সহ স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন শক্ত ঘাঁটি অবরোধের উদ্দেশ্যে।...হোটেলের আশেপাশে গোলাগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং রাত একটার দিকে গোটা শহরেই গুলিবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় (রহমান ২৯)।

সিডনি শনবার্গ আরো বলেন, প্রথমদিকে গোলাগুলি চলছিল বিক্ষিপ্ত, তবে রাত একটার দিকে তা জোরদার ও বিরামহীন হয়ে ওঠে এবং প্রায় তিনঘণ্টা ধরে এমনি চলে। প্রাণের ভয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আটকে থাকা বিদেশি সংবাদদাতারা কামানের গোলাবর্ষণের আগুন দেখতে পেয়েছেন, শুনেছেন এর শব্দ। উত্তর ঢাকায় অবস্থিত আমাদের হোটেল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, বাঙালিদের সংখ্যাধিক্যসম্পন্ন আধা-সামরিক বাহিনী ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-এর ব্যারাকসহ শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশাল দহনযজ্ঞ দেখা যাচ্ছিল (শনবার্গ ১৭)। ২৫ তারিখ রাতে 'নিহতের ঢল' অখণ্ড পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি ভাসিয়ে দিয়ে যায়। ইয়াহিয়া খান ১৯৭০-এর অক্টোবরে জাতিসংঘের সামনে যে 'পবিত্র প্রতিশ্রুতি' দিয়েছিলেন সেটি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্কবহরের নিচে পিষ্ট ও ধূলিসাৎ হয়ে যায় (হোসেন ১৪)।

কবি হেলাল হাফিজ 'গণহত্যার ভয়াবহ রাত' নিবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সংঘটিত গণহত্যা প্রসঙ্গে লেখেন, 'পরদিন ২৭ মার্চ সকালে শুনলাম কারফিউ তুলে নেওয়া হয়েছে।...হাবিবুল্লাহর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আমার হলের দিকে রওনা দিলাম। কার্জন হলের পেছন থেকে ব্রিটিশ কাউন্সিল আর এস এম হলের মাঝখান দিয়ে উঠলাম ইকবাল হলের মাঠে। যেতে যেতে পথের পাশে আর ফুটপাতে দেখি গুলিতে ক্ষতবিক্ষত বেশ কয়েকটি লাশ পড়ে আছে। এই প্রথম ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার শিকার হওয়া হতভাগ্য বাঙালিদের লাশ আমার চোখে পড়ল। পরের দৃশ্য আরও বীভৎস ও মর্মান্তিক। হলের পাশে বিশাল খোলা মাঠ। মাঠের কোণায় পা দিয়েই দেখি ৪০-৫০টা মৃতদেহ পড়ে আছে। আমাদের ইকবাল হলের ছাত্র। কেউ কেউ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বোঝা গেল না। হলের আশেপাশের কোয়ার্টারে কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের এবং তাঁদের বাসার কাজের লোকদেরও লাশ চোখে পড়ল। গুলিতে অনেকেরই দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। গেটের কাছে এসে দেখি আমাদের হলের দারোয়ান আর তাঁর ছেলের লাশ পড়ে আছে। আমি দ্রুত আমার রুমের সামনে গেলাম। দরজা বাইরে থেকে তালা দেওয়া। তাই ঘাতকেরা ধরে নিয়েছিল, ভেতরে কেউ নেই। দরজা ভাঙেনি। অন্য যে রুমে ছেলেদের পেয়েছে, তাদের মাঠে এনে সারি বেঁধে গুলি করে মেরেছে। ইকবাল হলেই গণহত্যার ঘটনা ঘটেছিল বেশি (*প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০২১)।'

মার্কিন ইতিহাসবিদ স্ট্যানলি উলপার্টের ভাষ্য অনুযায়ী, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ছাত্র হলগুলোতে পাঞ্জাবি-বেলুচ বাহিনীর অভিযানে মার্কিন এম-২৪ ট্যাংক ব্যবহার করা হয়েছিল। ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলে ঘুমিয়ে থাকা ছাত্রদের ওপর ট্যাংক থেকে অন্তত পাঁচ মিনিট বিরতিহীনভাবে মর্টার শেল নিক্ষেপ করা হয়। সেনারা শেল নিক্ষেপ করে ছাত্রাবাস দুটির দরজা-জানালা উড়িয়ে দেয় এবং গোলা ছোড়ার পরও যে ছাত্র, শিক্ষক ও কেয়ারটেকার বেঁচে ছিলেন, তাঁদের সবাইকে সেনারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলে। এই হত্যাকাণ্ডের আগাগোড়া জুড়ে ছিল টিক্কা খানের বাহিনী (*প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০২১)।' জগন্নাথ হলে চলা হত্যাকাণ্ড শেষে মৃতদেহগুলো হলের মাঠেই মাটিচাপা দেয় নরপশুরা। ২৬ মার্চ সকালে সৈন্যরা ৫ জনকে ধরে নিয়ে আসে হলের ভেতরে। তাঁদের দিয়ে বিভিন্ন কক্ষ, হলের ছাদ, বারান্দা থেকে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা লাশগুলো নিয়ে ট্রাকে তোলে। হলের মাঠের মাঝখানে আগে থেকেই একটি বিরাট গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। লাশগুলো সেখানে নিয়ে যায়

মাটিচাপা দেওয়ার জন্য। মৃতদেহগুলো মাটিচাপা দেওয়া শেষ হলে সেই ৫ জনকেও ঠিক গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করে সৈন্যরা। সেই ৫ জনের মধ্যে একজন ছিলেন কালীরঞ্জন শীল, যিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। সৈন্যরা চলে গেলে মৃতের স্তূপ থেকে তিনি দৌড়ে পালাতে সক্ষম হন। পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক লিখেছেন, 'আমি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার গণকবরগুলো দেখছিলাম। ৫ থেকে ১৫ মিটার ব্যাসার্ধের তিনটি গর্ত দেখতে পেলাম। সেগুলো সদ্য তোলা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে।...ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের চারপাশ দিয়ে আমি হাঁটতে শুরু করলাম। দূর থেকে মনে হয়েছিল হামলার সময় দুটো ভবনই মাটির সঙ্গে মিশে গেছে (*প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০২১)।'

ওয়াশিংটন পোস্ট এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বদেশের নাগরিক হত্যার জন্যে ইয়াহিকে দায়ী করে (*Washington Post*, 13 May 1971)। সে সময়ের অবরুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে লন্ডনভিত্তিক *দ্য সানডে টাইমস* পত্রিকার পাকিস্তান সংবাদদাতা অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস এর বর্ণনা থেকেও ধারণা পাওয়া যায়। এ পত্রিকায় বাংলাদেশের গণহত্যার ওপর তাঁর লেখা বিস্তারিত রিপোর্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুন 'Genocide: Full Report' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, মার্চের শেষ দিকে যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দুই ডিভিশন সৈন্য 'বাঙালি বিদ্রোহীদের' দমন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়, তখন তা গোপন রাখা হয়। কিন্তু, দুই সপ্তাহ পর পাকিস্তান সরকার আটজন সাংবাদিককে পূর্ববাংলা সফরের আমন্ত্রণ জানান। নিঃসন্দেহে সরকারের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের এ মর্মে অবহিত করা যে, দেশের পূর্বাংশে সবকিছু স্বাভাবিক চলছে। সাতজন সাংবাদিক উদ্দেশ্য মত কাজ করলেও অ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস তা করেন নি (রাজু ৩৫)। প্রকাশিত এ রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠায় বলা হয়, মার্চ মাসের শেষদিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের হাজার হাজার বেসামরিক অধিবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের পক্ষে এ ভয়ঙ্কর সংবাদ চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। কলেরা ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপেক্ষা করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৫০ লক্ষেরও বেশি বাঙালি ভারতে গিয়ে আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার কারণ এ হত্যাযজ্ঞ। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী শুধু বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকদের হত্যা করেনি, হিন্দু ও মুসলমানদের তারা নির্বিচারে হত্যা করেছে (মতিন ৭০)। তিনি আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে, অত্যন্ত সুস্থ মস্তিষ্কে গত মার্চে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালিয়েছে। এই সংগঠিত গণনির্যাতনের শিকার কেবল পূর্ব বাংলার হিন্দুরা নয়, যারা সাড়ে ৭ কোটি জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। বরং হাজার হাজার বাঙালি মুসলিমও এর শিকার। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র, শিক্ষক, আওয়ামী লীগ ও বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী এবং সেনাবাহিনী ও পুলিশের ১ লাখ ৭৬ হাজার বাঙালি বিদ্রোহী সদস্য, যাকেই সেনাবাহিনী ধরতে পারছে, তাদের সকলে (মাসকারেনহাস ১৪-১৫)। যার কারণে বানের স্রোতের মতো নিজের বাড়িঘর, সহায়-সম্পদ ফেলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মানুষ ভারতে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছে (*The Sinday Times*, 13 June 1971)। সিডনি শনবার্গ বলেন,

> ঢাকায় অবস্থিত বিদেশী সাংবাদিকদের কাছে এটা মনে হয়েছিল ট্যাঙ্ক, কামান ও ভারি মেশিনগান সজ্জিত হয়ে কার্যত নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ– যে নাগরিকেরা বিগত ডিসেম্বরের নির্বাচনে অর্জিত তাদের রাজনৈতিক গরিষ্ঠতার দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছিল অহিংস পন্থায়, ধর্মঘট ও অন্যান্য অসহযোগ পদ্ধতি অবলম্বন করে। এবং চলতি সপ্তাহান্তে যথেচ্ছ হত্যাকাণ্ডের অকাট্য এমন সব তথ্য-প্রমাণ বেরিয়ে এসেছে, যার দ্বারা নিরাবেগ ভারতীয় কর্মকর্তা ও পশ্চিমা কূটনীতিকদের মনে আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি নির্মূল করতে পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি একেবারে বাল্লাহীন (শনবার্গ ৫৩)।

সাংবাদিক জন পিলজারও *Daily Mirror* পত্রিকায় পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা ও নির্যাতনের এক ভীতিজনক বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর বিরুদ্ধে গণহত্যামূলক অভিযান পরিচালনা করছে। গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ করে শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থক এবং আওয়ামী লীগের সদস্যদের হত্যা করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। সম্ভবত লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে পাঞ্জাবি ও পাঠান সৈন্যরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে (*Daily Mirror*, 16 June 1971)। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অতর্কিত বর্বর আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মানুষকে হত্যা ও নির্যাতন করে তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রতি জোরপূর্বক আনুগত্য স্বীকার করিয়ে নেওয়া এবং এর মাধ্যমে দেশের একটি বড় অংশকে দেশ থেকে পলায়নে বাধ্য করা। তাদের দলিলপত্র ও লেখনীতে 'আমাদের কোনো মানুষ প্রয়োজন নাই, শুধু জমি প্রয়োজন', 'সবুজ দেশটাকে আমরা লাল রংয়ে রূপান্তরিত করব' ইত্যাদি বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। *বাল্টিমোর* সান-এর সাংবাদিক জন উডরাফ মন্তব্য করেন, 'বাংলাদেশের একমাত্র বাস্তবতা হলো ভীতি এবং মৃত্যু ছিল সহজ এবং আকস্মিক। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেয়া, বসতির পর বসতিতে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া এই ছিল স্বাভাবিক। গণহত্যা বা ধ্বংসসাধনে কোনো বাধাবিপত্তি বা বিবেকের দংশন ছিল না (*Baltimore Sun*, 13 November 1971)'।

মার্ক টালি একাত্তরে বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ভাষ্যকার ছিলেন। 'আমরা হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ দেখেছি' শিরোনামে এক নিবন্ধে তিনি লেখেন, 'সে সময় আমি বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ভাষ্যকার হিসেবে কাজ করতাম। তাই আমি জড়িয়ে গিয়েছিলাম। এই চাকরির সুবাদেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাযজ্ঞের পর প্রথম সাংবাদিক দলের সদস্য হিসেবে সেখানে ঢুকতে পেরেছিলাম।...তাই সেনাবাহিনীর চালানো হত্যাযজ্ঞ বাংলাদেশের জনমনে কী প্রভাব ফেলছে, সেটি তুলে ধরা সাংবাদিকদের মধ্যে ছিলাম আমি।...আমরা হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ দেখতে পেয়েছিলাম। সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ জোগাড় করতে পেরেছিলাম। আমরা দেখেছি, কেমন ক্ষতি হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ক্ষতিসাধন করা হয়েছে, তা-ও আমরা দেখেছি। ঢাকা থেকে রাজশাহী যাওয়ার সময় রাস্তার পাশের গ্রামগুলোকে দেখেছি ভস্মীভূত অবস্থায়। এটা স্পষ্ট ছিল যে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নির্বিচার আগুন দিয়েছে। তারা গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করেছে, যাতে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে (*প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ১৯৭১)।' বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা এ গণহত্যা চালায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলোঃ নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিচারে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা, বয়লারে ও ফার্নেসে জীবন্ত নিক্ষেপ করা, শরীরে আগুন ধরিয়ে মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, ধানভাঙা ঢেঁকির গর্তে মাথা রেখে ঢেঁকিতে পাড়া দিয়ে মাথার খুলি ভেঙ্গে চুরমার করা, নির্যাতন শেষে কুয়ায় নিক্ষেপ করা, পশুর মতো জবাই করা, জীবিত কবর দেওয়া, সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করা, ধারালো অস্ত্র দ্বারা জীবন্ত মানুষের শরীরের মাংস টুকরো করে কাটা, চলন্ত গাড়ির পেছনে বেধে প্রচণ্ড বেগে জিপ চালিয়ে টেনে-হিঁচড়ে হত্যা করা এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করা (কবির ১২)। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল ১৯৭১ সালের ২৫ মে ওয়াশিংটনকে জানিয়েছিলেন যে,

> Evidence of a systematic percecution of the Hindu population is too detailed and too massive to be ignored. While the Western mind boggles at the enormity of a possible planned eviction of 10 million people, the fact remains that the officers and men of the [Pakistan] Army are behaving as if they had been given carte blanche to rid East Pakistan of these 'subversives' (Raghavan 52).

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা বিভিন্ন বাহিনী গঠনের মাধ্যমে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন, গণহত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি অপকর্ম পরিচালনা করে (রহমান ৩০৩-৩০৯)। মুক্তিযুদ্ধের সময় নথিভুক্ত নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার। এদের মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৩ হাজার, ইপিআরের ১০ হাজার এবং পুলিশের ১৩ হাজার সদস্য ছিল। বাকি প্রায় ৯৪ হাজার বীর মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন বেসামরিক মানুষ (হোসেন ১২)। সমগ্র বাংলাদেশকে এক বধ্যভূমিতে পরিণত করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা। রাজধানী ঢাকা শহর থেকে শুরু করে সমস্ত শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার কিছুই তাদের হত্যাকাণ্ড, ধ্বংসযজ্ঞের তাণ্ডবলীলা থেকে রেহাই পায়নি (দে ৫৫)। মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে পাকিস্তানি হায়েনাদের দ্বারা ৩০ লক্ষেরও অধিক মানুষ শহিদ হন। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী এবং তাদের দোসরদের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যা, জাতিগত নিপীড়ন এবং হিন্দু বিদ্বেষের কারণে প্রাণভয়ে ও নিরাপত্তার সন্ধানে লাখ লাখ মানুষ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। এপ্রিল মাসে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল ১,১৯,৫৫৬ জন এবং পরবর্তী মাসগুলোতে তা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে ১৫ ডিসেম্বরে শরণার্থীর সংখ্যা ৯৮,৯৯,৩০৫ জনে উন্নীত হয় (*Bangladesh Documents* 672)। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৩৩তম বার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয় যে, মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সৈন্যরা স্বল্পতম সময়ে ১৫ লাখ মানুষ হত্যা করে। এতে বলা হয়, বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে প্রতিদিন গড়ে ৬০০০ থেকে ১২০০০ মানুষ হত্যা করা হয়েছিল। এখানে গণহত্যা দ্রুত সংঘটিত হয়েছে এবং জনঘনত্ব থাকায় বেশি মানুষকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছে। যেমন: চুকনগরে কয়েক ঘণ্টায় প্রায় ১০,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের গণহত্যায় মৃতের সংখ্যা ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) বলে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র *প্রাভদা* উল্লেখ করে (মামুন ১৩)। স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক মানুষ হত্যার এরূপ ঘটনা বিশ্বের গণহত্যার ইতিহাসে নজিরবিহীন (মামুন ১১৬)। এই গণহত্যার তীব্রতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত হলোকাস্টকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল (কাদের ১৩)। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আইয়ুব ও কে. সুব্রামানিয়ান বলেন, 'The Killings in Bangladesh were equal to the use of seventy-five Hiroshima type nuclear weapons (Ayoob 168)'. স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্ব শান্তি পরিষদের একটি প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসেন। এই দলের নেত্রী ছিলেন ৯০ বছর বয়স্কা মাদাম ইসাবেলা। তিনি ঢাকা শহর, উপকণ্ঠ এবং কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করে ২২ জানুয়ারি হোটেল পূর্বাণীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উল্লেখ করেন: 'আমি হিটলারের কয়েকটি নির্যাতন শিবিরও স্বচক্ষে দেখেছি। কিন্তু বাংলাদেশে যে নির্যাতন হয়েছে সে বীভৎসতার কোনো তুলনা নেই। এটা নজিরবিহীন। আমি সমগ্র বিশ্বকে এই বীভৎসতার কথা জানাবো' (বিশ্বাস ১০৮)। *The New Statesman* পত্রিকায় 'The Blood of Bangladesh' শীর্ষক শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়,

> If blood is the price of people's right to independence, Bangladesh has overpaid. Of all the present struggles to bring down governments and change frontiers in the name of national freedom, the war in East Bengal may prove the bloodist and briefest. On this level alone East Pakistanis have achieved a record of suffering. But even if their movement is destroyed within a few days or weeks, it may only be a temporary defeat in a war of liberation which will eventually be recognised as just (*The New Statesman,* 16 April 1971).

পাকিস্তানি সামরিক জান্তা দীর্ঘ ৯ মাস ধরে সাংবাদিকতা, তথ্যসংগ্রহ ও বিতরণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। তাই গণহত্যা ও নির্যাতনের অনেক তথ্যই অজানা রয়ে যায়। মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের ২০ জেলায়

গণহত্যার সংখ্যা ৫,১২১টি। গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের জরিপ অনুযায়ী প্রতিটি গণহত্যায় ৫ থেকে ১ হাজারেরও বেশি মানুষ হত্যার তথ্য পাওয়া গেছে। এ ২০টি জেলা হলো: গাইবান্ধা, জামালপুর, নড়াইল, পঞ্চগড়, মৌলভীবাজার, যশোর, লালমনিরহাট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, বরিশাল, নীলফামারী, নারায়ণগঞ্জ, বগুড়া, নাটোর, কুড়িগ্রাম, পাবনা, রাজশাহী, সাতক্ষীরা, ভোলা এবং খুলনা। ২০ টি জেলার বধ্যভূমির সংখ্যা ৪০৪, গণকবর ৫০২টি এবং নির্যাতন কেন্দ্র ৫৪৭টি। পাকিস্তানি বাহিনীর অপারেশন সার্চলাইটের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও সাধারণ বাঙালি বিবেচিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের সুদীর্ঘ নয় মাসে শিশু, বৃদ্ধ কিংবা নারী কেউই বর্বর এই হত্যাযজ্ঞ হতে রেহাই পায়নি। মূলত মুক্তিযুদ্ধকালে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের আওতায় বর্বর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নির্বিচারে গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের ঘটনা ছিল সুপরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ (মন্তাজ ৪৮)। *Genocide ’71 An Account of the Killers and Collaborators* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

> During the Liberation War, the prime targets of the Pakistani forces were the Bengali students and intelligentsia. Significantly, the crackdown on the night of March 25 commenced with an attack on the Dhaka University Campus. The first victims to fall before these hordes were the teachers of the University Censure, persecution, harassment, oppression were constant factors in the treatment of the intellectuals during the nine-month period of the war. The final victims of the Pakistanis were also the Bengali intellectuals: during the last few days before the surrender, the Pakistani forces, with the active assistance of the Al-Badr, killed large numbers of Bengali writers, teachers, journalists (Sharif 190).

নারী নির্যাতন ও হত্যা:

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা বাঙালি নারীর ওপর অত্যাচার ও নির্যাতনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কুৎসিত পদ্ধতি অবলম্বন করতো। হামুদুর রহমান কমিশনের মতে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা ২৫ মার্চ খারাপ হয়ে যায়, যখন ইয়াহিয়া খান সেখানে মানুষের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা শুরু করেন। এক ব্রিটিশ সাংবাদিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী হলে দেখা ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন: ৩টা-সোয়া ৩টার দিকে ৩৫০ থেকে ৪০০ পাকিস্তানি মিলিটারি ওখানে হামলা করে। তাঁরা এক এক করে তাঁদের কাপড় খুলে নেয়। আতঙ্কে তাঁদের মুখ থেকে চিৎকার বের হচ্ছিল। শাড়ি, সালোয়ার আর ব্রা টেনে টেনে এক দিকে ফেলে দেওয়া হলো। মেয়েদেরকে তাঁদের স্তন ধরে দাঁড় করানো হলো এবং ছড়ি দিয়ে পেঠানো হলো। বৃহৎ সংখ্যক সামরিক ও অসামরিক অফিসার যারা কমিশনের সামনে হাজির হয়েছিলেন তাঁরা সেই ভয়াবহ দিনগুলোর বিবরণ দিয়েছেন (আল্‌হেলাল ৬৫)। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যবহৃত কৌশলগুলো হলো: ১) বাঙালি হিন্দু নারী, কিশোরী ও যুবতীকে গণহারে ধর্ষণ ও হত্যা করা, ২) ধর্ষণোত্তর তাদের পুনরায় ভোগের জন্য এদেশীয় সহযোগী বাহিনীর হাতে অর্পণ করা, ৩) মুসলমান নারীদের ঘটনাস্থল কিংবা বাসস্থানে এককভাবে কিংবা পালাক্রমে স্বামী-সন্তান, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি ও আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে ধর্ষণ করা, ৪) বাঙালি তরুণীদের পাকিস্তানি শিবিরে বন্দিপূর্বক সামরিক ভোগ্যপূর্ণ ও যৌনদাসীরূপে ব্যবহার করা, ৫) বাঙালি কিশোরী, যুবতী ও নারীকে ধর্ষণের পর তাদের স্তন, উরু ও জননাঙ্গসহ বিভিন্ন অংশ কাটা, ৬) শারিরীক ও পাশবিক নির্যাতনের পর পৈশাচিকভাবে হত্যা করা (হাসান ১৪)। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা পুরো এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করতে নারী, শিশু যাকে পেয়েছে হত্যা করেছে। গণহত্যায় ২টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে: ধর্ষণের পর নারীকে হত্যা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে: ধর্ষণের পর লোকলজ্জার ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা।

গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী মো. মতিউর রহমান বলেন, 'ঐদিন দেখেছিলাম একজন মৃত মায়ের বুকের উপর একটি শিশু তখনো তার মায়ের বুকের দুধ খাওয়ার চেষ্টা করছে (মামুন ১১৪-১১৫)।'

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রায় ১৪ লক্ষ নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত এবং স্বামী-পুত্র-কন্যা বা অভিভাবক হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন (বেগম ১৮৮)। অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত নিউজ ম্যাগাজিন *পিক্স*-এর তথ্যানুযায়ী মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা এদেশের ৩ লক্ষ নারী ধর্ষিতা হয়েছেন (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ জুলাই ১৯৭২)। 'ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি'র চলতি গবেষণা অনুযায়ী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা মুক্তিযুদ্ধকালীন যে ব্যাপক গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালানো হয় তাতে প্রায় আঠারো লাখ মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর বাইরেও আরও হিসাব রয়েছে। এ যাবৎ গণকবর ও গণহত্যা স্পট আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় ৯২০টি। ৮৮টি নদী ও ৬৫টি ব্রিজের উপরে হত্যা ও নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। চার লাখ ষাট হাজার নির্যাতিত নারীর পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে (হাসান ১৫২-১৫৩)। দেশের ৪২টি জেলার ২৫টি থানায় নির্বাচিত ২৬৭ জন ব্যক্তির সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, একাত্তরে দুই লাখ দুই হাজার নারী ধর্ষিতা হয়েছেন ওইসব স্থানে। আর একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সারা দেশে ধর্ষিতা ও নির্যাতিত নারীর সংখ্যা সাড়ে চার লাখের ওপরে। শুধুমাত্র সিলেটে ৩০ হাজার বীরাঙ্গনার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল (ফেরদৌসী ৮৩)। চট্টগ্রাম সেনানিবাস একাত্তরের বর্বরতার প্রথম সাক্ষী। এখানে প্রায় ২৫০০ নিরস্ত্র বাঙালি সৈনিককে হত্যা করা হয় একাত্তরের প্রথম প্রহরে। পাশাপাশি আশেপাশের এলাকাগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক সাধারণ জনসাধারণকে এখানে এনে হত্যা করা হয়। সেনানিবাসের বাইরে প্রথম গণহত্যা ঘটে চট্টগ্রাম বন্দরে। বন্দরের ১৭ নম্বর জেটিতে ২৭ মার্চ প্রায় ১১২ জন নিরস্ত্র বাঙালি সৈনিক পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান (কাদের ৩৫)। গণহত্যার ফলে দেশের বেশ কয়েকটি গ্রামের নারীরা বিধবা হয়ে পড়েন। এসব গ্রাম বিধবা পল্লী হিসেবে পরিচিত। কয়েকটি বিধবা পল্লীর নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

১। শেরপুর জেলার বানিয়াপাড়া, সূর্যদি, আন্ধারিয়া গ্রাম। ২৪ নভেম্বর এসব গ্রামের প্রায় ১৫০ জন মানুষকে একসাথে হত্যা করা হয়। সেদিন প্রায় ৫০ জন নারী বিধবা হন। এ গ্রামগুলো বিধবা পল্লী হিসেবে পরিচিত।

২। ২৬ জুলাই শেরপুর জেলার সোহাগপুর গ্রামের ১৮৭ জন নিরীহ মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। ফলে সেখানের প্রায় ৫৪ জন নারী বিধবা হয়েছিলেন। গ্রামটিও বিধবা পল্লী হিসেবে পরিচিত।

৩। ঠাকুরগাঁও জেলার চকহলদি, জাঠিভাঙ্গা, জগন্নাথপুর, সিঙ্গিয়া, চণ্ডীপুর, আলমপুর, বাসুদেবপুর, গৌরীপুর, মিলনপুর, খামারভোপলা, ঢাবঢুবসহ মোট ১২টি গ্রামের কয়েক হাজার নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ ২২ এপ্রিল সকাল বেলা মৃত্যুভয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এ সংবাদটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিকট পৌঁছালে ২৩ এপ্রিল গণহত্যা চালানো হয়। ঐদিন ৩৫০ জন নারী বিধবা হন। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন চকহলদি গ্রামের। তাই গ্রামটি বিধবা পল্লী হিসেবে পরিচিত। কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বলেন,

> মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহর থেকেই পাকিস্তানিরা তাদের দোসরদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে। বহু স্থানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেও তারা উপাসনারত ও আশ্রয় গ্রহণকারী নিরপরাধ মানুষগুলিকে গুলি তরে হত্যা করেছে, ধরে নিয়ে গুলি করে ও জবাই করে হত্যা করেছে। ঘাতকেরা ধর্মের নামে সবচেয়ে বড় ধর্মবিরোধী কাজ করেছিল। অনেক স্থানেই হত্যার পর ধর্মীয় বিধিবিধান না মেনেই নিহতদের মৃতদেহ নদীতে ফেলে, তাদের দ্বারা খননকৃত গণকবরে মাটি চাপা দিয়ে, মৃতদেহ একস্থানে জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলে তারা। মৃতদেহের প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন করেনি তারা। সর্ব ক্ষেত্রেই ধর্মীয়

> বিধিবিধান ভঙ্গ করেছে তারা। ধর্মরক্ষার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা এদেশের অসংখ্য ধর্মপ্রাণ ও নিরীহ জনগণকে নির্মমভাবে হত্যা করে (জহির ৬৬-৬৭)।

১৯৭১ সালে গণহত্যা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে ৬ ডিসেম্বর যুদ্ধকালীন পাকিস্তানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব 'হিলাল-ই-জুররত'-এ ভূষিত হয়। তারা হলোঃ লে. জেনারেল টিক্কা খান, লে. জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী, লে. জেনারেল আবু বকর ওসমান মিঠ্‌ঠা, লে. জেনারেল গোলাম ওমর, লে. জেনারেল রহিম খান, ব্রিগেডিয়ার এস এ আনসারি এবং ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব।

গণহত্যার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:

২০১৭ সালে জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চকে 'বাংলাদেশ গণহত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামরিক নৃশংসতা শুরুর দিনটিকে জাতীয়ভাবে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালনের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। একইসাথে এই নৃশংসতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সেই থেকে সরকারীভাবে ২৫ মার্চ 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। তবে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরেরা একাত্তরের ২৫ মার্চ বাংলাদেশে যে জাতিগত নিধনযজ্ঞ ও মানবতাবিরোধী অপরাধ শুরু করেছিল; সেসব তারা ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণের পূর্ব পর্যন্ত চালিয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক সংঘটিত এই অপরাধযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জেনোসাইড ওয়াচ এবং লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক বাঙালিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধযজ্ঞকে জেনোসাইড ওয়াচ গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালির ওপর সংঘটিত অপরাধযজ্ঞকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংস্থা দুটি জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। গণহত্যাবিষয়ক সংস্থাগুলোর স্বীকৃতির ফলে ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে সহযোগিতা করবে। ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব জেনোসাইড স্কলারস (আইএজিএস) ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশে গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়েছে (*বণিকবার্তা*, ২৪ এপ্রিল ২০২৩)। আইএজিএস কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশন বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট থেকে যথাযথ স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে পালনের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘে আবেদন করেছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ব্যাপকতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার দিক থেকে পৃথিবীর যেকোনো জাতিসংঘ স্বীকৃত গণহত্যার চেয়ে ভয়াবহতার একটি চিত্র তুলে ধরে। কিন্তু তা এখনো জাতিসংঘে আন্তর্জাতিকভাবে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয়নি। কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এডাম জোনস ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বলেছেন, বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে ভয়াবহ গণহত্যা সংঘটিত হলেও তা আন্তর্জাতিকভাবে আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি পায়নি। বরং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'গৃহযুদ্ধ', 'পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ' প্রভৃতি হিসেবে দেখানোর তীব্র প্রবণতা রয়েছে (*প্রথম আলো*, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬)। বাংলাদেশের গণহত্যা স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণ হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অনীহাকে দায়ী করেন আর্জেন্টিনার আইনজীবী এবং সে দেশের গণহত্যার বিচারের আন্দোলনের কর্মী ভিক্টোরিয়া মাসামিনো। তিনি

বলেন, নিজেদের কোনো স্বার্থ না থাকলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গণহত্যা বা এর বিচারে দেশীয় ট্রাইব্যুনালের বিষয়ে আগ্রহ দেখায় না। আন্তর্জাতিকভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ও রুয়ান্ডা, সিয়েরা লিওন ও কম্বোডিয়ার গণহত্যা বিশ্ব-স্বীকৃতি পাওয়ার পর আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গোড়াপত্তন এক নতুন ঐতিহাসিক ধারার সৃষ্টি করেছে। এর ফলে জাতীয়ভিত্তিক আদালতগুলোও এখন নিজ নিজ দেশে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন করেছে। আন্তর্জাতিক আদালতের নিয়মবিধি অনুসরণ করায় সেগুলোর সিদ্ধান্তকে আন্তর্জাতিকীকরণে তেমন বেগ পেতে হচ্ছে না (আলম ১৭-১৯)।

আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিকভাবে কাজ করছে। ২০২৪ সালের ২৬ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশন-এর নির্বাহী পরিচালক এলিসা ভন ফরগে 'পলিটিকস অব জেনোসাইড রিমামবারেন্স' শীর্ষক সেমিনারে বলেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি জঘন্য গণহত্যার শিকার হয়েছে। বাংলাদেশে যুদ্ধ চলাকালে অনেক সাংবাদিক 'জেনোসাইড' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯৭২ সালে ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্টসের প্রতিবেদনে বলা হয়, এখানে 'অ্যাক্টস অব জেনোসাইড' সংঘটিত হয়েছে (*প্রথম আলো*, ২৬ মার্চ ২০২৪)। নেদারল্যান্ডসের সাবেক সংসদ সদস্য ও মানবাধিকারকর্মী হ্যারি ভ্যান বোমেল বলেন, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। যুক্তরাজ্যের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ক্রিস ব্ল্যাকবার্ন বলেন, বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে জাতিসংঘ জানে। আমরা চাই, গণহত্যার স্বীকৃতি দিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সঠিক কাজটি করুক (*প্রথম আলো*, ২১ মে ২০২৩)।

উপসংহার:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের নাজি বাহিনী ইহুদি জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যা চালিয়েছে। আর্মেনিয়া, রুয়ান্ডা, কম্বোডিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গণহত্যার নজির রয়েছে। তবে রাজনৈতিক বা জাতিগত উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো গণহত্যা কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়নি। একাত্তরের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী গণহত্যার সূচনাই করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী হত্যার মধ্য দিয়ে। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলেই হত্যার শিকার হয়েছেন। তারা বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও স্বাধীনতার দাবিকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। সকল বয়সের মানুষই পাকিস্তানিদের দ্বারা নিপীড়নের শিকার হয়েছিলেন; তবে যুবকদের সংখ্যা ছিল বেশি। কারণ যুবকদের থেকে তারা প্রতিরোধের শঙ্কা করেছিল। সমগ্র বাংলাদেশকে এক বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসররা। স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক মানুষ নিহত হওয়ার এরূপ ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই গণহত্যার তীব্রতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সংঘটিত হলোকাস্টকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ২০১৭ সালে জাতীয় সংসদে ২৫ মার্চকে 'বাংলাদেশ গণহত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকেই বাংলাদেশে ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কর্তৃক সংঘটিত এই অপরাধ ও নৃশংসতাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জেনোসাইড ওয়াচ, লেমকিন ইনস্টিটিউট ফর জেনোসাইড প্রিভেনশনসহ গণহত্যাবিষয়ক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংগঠন। আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থাগুলোর স্বীকৃতির ফলে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে সহযোগিতা করবে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাবে; এটাই সকলের প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র

Evans, Graham & Jeffrey Newnham. *The Penguin Dictionary of International Relations*. Penguin Books, 1998.

এম. এ. হাসান। "গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ"। মো. আখতারুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.)। *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা*। পুনঃমুদ্রণ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৮।

মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.)। *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*। দ্বিতীয় খণ্ড, সময় প্রকাশন, ২০০৫।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*। ২য় খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।

রহিম, মো. আবদুর। *পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ (১৯৪৭-১৯৭১)*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০২২।

Jackson, Robert. *South Asian Crisis India-Pakistan-Bangladesh*. Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1978.

Imam, Jahanara. *Of Blood and Fire: The Untold Story of Bangladesh's War of Independence*.

Mustafizur Rahman (Translated by). Second Impression, The University Press Limited, 2007.

Raja, Khadim Hussain. *A Stranger in My Own Country East Pakistan 1969-1971*.The University Press Limited, 2012.

আনিসুজ্জামান। *আমার একাত্তর*। সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

Khan, Rao Farman Ali. *How Pakistan got divided*. Jang Publishers, 1992.

ইসলাম, রফিকুল। *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*। কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

দারা, সাইদ হাসান। *অপারেশন সার্চলাইট : পরিকল্পনা ভিত্তি এবং বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ*। অনন্যা, ২০২০।

ভূঁইয়া, গোলাম কিবরিয়া। '২৫শে মার্চ '৭১ পরবর্তী বাংলাদেশের কয়েকদিনঃ স্মৃতিকথার আলোকে'। *বাংলাদেশ: ইতিহাস, সমাজ ও রাজনীতি*। অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১০।

মুহিত, আবুল মাল আবদুল। *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*। তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০১২।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার। *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা*। তৃতীয় সংস্করণ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৭।

শরীফ, আহম্মেদ। *বাংলাদেশের-গণহত্যা নির্যাতন* ১৯৭১। বাংলাদেশের জন-ইতিহাস গ্রন্থমালা ৭। সময় প্রকাশন, ২০২১।

Salik, Siddiq. *Witness to Surrender*. The University Press Limited, 1977.

Batabyal, Guru Saday. *Political-Military Strategy of the Bangladesh Liberation War 1971*. Routledge, 2021.

Choudhury, G.W. *The Last Days of United Pakistan*. The University Press Limited, 1998.

শরীফ, আহম্মেদ। *মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার প্রকৃতি ও স্বরূপ: ১৯৭১*। গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ২০২০।

Mohan, Jag (Ed.). *The Black Book of Genocide in Bangladesh*. Geeta Book Centre, 1971.

পেইন, রবার্ট। *ম্যাসাকার*। খায়রুল আলম মনির (ভাষান্তর)। হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৮।

পারভিন, শাহনাজ। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*। বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

Ganguly Sumit. *Conflict Unending: India-Pakistan Tensions since 1947*. Columbia University Press, 2002.

শফিউল্লাহ, কে. এম.। *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*। সিদ্দিকুর রহমান (অনুদিত)। আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

Miller, Brown. *Against Our Will: Men, Women and Rape*. Powcett Books, 1993.

Jahan, Rounaq. *Bangladesh Politics Problems and Issues*. Fourth Impression, The University Press Limited, 1980.

ভৌমিক, রীতা। *ঢাকায় গণহত্যার প্রথম পর্ব (২৫ থেকে ৩১ মার্চ : ১৯৭১)*। গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র। ১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ২০১৯।

চৌধুরী, আফসান (সম্পা.)। *১৯৭১ গণনির্যাতন-গণহত্যা কাঠামো, বিবরণ ও পরিসর*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ২০২২।

সেলিম, মোহাম্মদ। *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় আন্দোলন, সশস্ত্র সংগ্রাম ও স্বাধীনতা*। অনন্যা, ২০২২।

চক্রবর্তী, রতনলাল (সংকলিত ও সম্পাদিত)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা: ১৯৭১ জগন্নাথ হল*। তৃতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ২০১৯।

কামাল, মেসবাহ (সম্পা.)। *একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*। প্রথম খণ্ড, আগামী প্রকাশনী, ২০২২।

বিশ্বাস, সুকুমার। *অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিকজান্তা ও তার দোসরদের তৎপরতা*। সুবর্ণ, ২০০১।

কবির, শাহরিয়ার। *একাত্তরের গণহত্যা নির্যাতন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*। চতুর্থ মুদ্রণ, সময় প্রকাশন, ২০১৮।

বিশ্বাস, সুকুমার। *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*। পঞ্চম মুদ্রণ, অনুপম প্রকাশনী, ২০২০।

Mascarenhas, Anthony. *The Rape Of Bangladesh*. Vikas Publications, 1971.

হাসান, এম. এ.। 'ঢাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে সামরিক, আধা-সামরিক, পুলিশ, ইপিআর (২৫ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল) ও জনপ্রতিরোধ'। শরীফ উদ্দীন আহমেদ (সম্পা.)। *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা ১৯৭১*। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০।

সরকার, দিব্যদ্যুতি। *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : শরণার্থী সমস্যা ও ভূ-রাজনীতি*। বাংলা একাডেমি, ২০২০।

সরকার, মোনায়েম ও অন্যান্য (সম্পা.)। *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি*। প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ২০০৮।

মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.)। *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*। প্রথম খণ্ড, সময় প্রকাশন, ২০১৩।

Niazi, A. A. K.. *The Betrayal of East Pakistan*. Oxford University Press, 1998.

মামুন, মুনতাসীর। *ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, সময় প্রকাশন, ২০০৮।

সাইয়িদ, আবু। *গণহত্যা '৭১*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, অনন্যা, ২০২২।

Jacob, JFR. *Surrender At Dacca Birth Of A Natio*n. Third impression, The University Press Limited, 2004.

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পা.)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*। প্রথম খণ্ড, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।

শনবার্গ, সিডনি। *ডেটলাইন বাংলাদেশ : নাইন্টিন সেভেন্টিওয়ান*। মফিদুল হক (অনু)। দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।

হোসেন, আশফাক। *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ*। বাংলা একাডেমী, ২০০২।

রাজু, জাকির হোসেন। *গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ*। প্রথম সংস্করণ, জাগৃতি প্রকাশনী, ২০১১।

মতিন, আবদুল। *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালি : যুক্তরাজ্য*। সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫।

মাসকারেনহাস, অ্যান্থনি। *গণহত্যা*। সুবীর বৈরাগী (অনু.)। দ্যু প্রকাশন, ২০২১।

কবির, শাহরিয়ার। *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*। সময় প্রকাশন, ২০০০।

Raghavan, Srinath. *1971 A Global History of the Creation of Bangladesh*. Harvard University Press, 2013.

রহমান, মো. মাহবুবর। *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১)*। সপ্তম মুদ্রণ, সময় প্রকাশন, ২০১৫।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার। *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা: তত্ত্ব ও পদ্ধতি*। অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।

দে, তপন কুমার। *বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের গণহত্যা ও নারী ধর্ষণ*। রাবেয়া বুকস্, ২০১৭।

Bangla Desh Documents. Vol. 2. Ministry of External Affairs, Government of India, 1972.

মামুন, মুনতাসীর। "গণহত্যা ও সংখ্যাতত্ত্বের খেলা"। মুনতাসীর মামুন (সম্পা.)। *গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ*। খণ্ড: ৫, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, অনন্যা, ২০২২।

মামুন, মুনতাসীর। *বাংলাদেশ ১৯৭১ গণহত্যা-নির্যাতনের রাজনীতি*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ২০২০।

কাদের, চৌধুরী শহীদ। *বাংলাদেশ গণহত্যা ১৯৭১ ধর্ম, লিঙ্গ ও ভূগোল*। মাওলা ব্রাদার্স, ২০২২।

Ayoob, Mohammed & K. Subrahamanyan. *Liberation War*. S. Chand & Co., 1972.

বিশ্বাস, সুকুমার। *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ভূগোল-ইতিহাস*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ২০১৭।

মন্তাজ, সাহেদ ও কুতুব আজাদ (সম্পা.)। *মুক্তিযুদ্ধে নারীগাথা*। রাবেয়া বুকস্, ২০১৮।

Sharif, Ahmed and others (Edited by). *Genocide '71 An Account of the Killers and Collaborators*. Muktijuddha Chetana Bikash Kendra, 1987.

আল্‌হেলাল, বশীর। *একাত্তরের গণহত্যা হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট*। পঞ্চম মুদ্রণ, দিব্য প্রকাশ, ২০১৯।

হাসান, এম. এ.। *যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ*। ওয়ার ক্রাইমস্ ফ্যাক্টস্ ফাইন্ডিং কমিটি, ২০০০।

মামুন, মুনতাসীর (সম্পাদিত)। *গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ* ২। গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র, ২০২১।

বেগম, মালেকা। *বাংলার নারী আন্দোলন*। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯।

হাসান, এম. এ.। "গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধ"। মো. আখতারুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.)। *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা*। পুনঃমুদ্রণ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ২০১৮।

ফেরদৌসী, জান্নাত-এ-। *বঙ্গবন্ধু এবং মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনা*। আগামী প্রকাশনী, ২০২১।

কাদের, চৌধুরী শহীদ। *গণহত্যা-বধ্যভূমি ও গণকবর জরিপ চট্টগ্রাম জেলা*। গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র। ১৯৭১:

গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ২০১৯।

জহির, কাজী সাজ্জাদ আলী। 'মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা ও নির্যাতন'। চৌধুরী শহীদ কাদের (সম্পা.)। *১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ*, গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র। গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ২০১৭।

আলম, জগলুল। *১৯৭১ বাংলাদেশে গণহত্যা*। বাঙ্গালা গবেষণা, ২০১৯।